থেকে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করতে চাই। অতপর সে আরও এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে বিয়েতে এক হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইয়া আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছে। আমি জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আল্লাহ্র কাছে এর বিনিময়ে জান্নাতের গোলাম ও জান্নাতের আসবাবপত্র প্রার্থনা করল।

এরপর ঘটনাক্রমে মু'মিন লোকটি দারুন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হল। সে নিজের অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করলে বন্ধু বলল ঃ তোমার ধনসম্পদ কি হল? উত্তরে সে তার দান-খয়রাতের সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে বলল ঃ তুমি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দেব না। এরপর তারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমুদয় ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহান্নামী সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। —(দুররে মনসুর)

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা ঃ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফির অথবা আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ ঃ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে ঃ আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই

এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অজিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ অর্থাৎ এমনি ধরনের সাফল্যের জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ
الشَّيٰطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى
الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثٰرِهِمْ
يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا
عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

(৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি জালিমদের জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদ্গত হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফিররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আল্লাহ্‌র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাব ও সওয়াবের মূল্যায়ন করার পর এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দান এবং কাফিরদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছেঃ) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ জান্নাতের এ নিয়ামত, যা মু'মিনদের জন্য রয়েছে) উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ (যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে)? আমি এ বৃক্ষকে (পরকালের শাস্তি সাব্যস্ত করা ছাড়াও দুনিয়াতে) জালিমদের জন্য পরীক্ষার বিষয় করেছি। (আমি দেখতে চাই, তারা এর কথা শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে? বস্তুত কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিদ্রূপছলে বলে, যাক্কুম তো মাখন ও খোরমাকে বলা হয়, যা খুবই সুস্বাদু বস্তু। তারা আরো বলে, যাক্কুম যদি বৃক্ষই হবে তবে তা জাহান্নামের আগুনে কেমন করে থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেনঃ) এটা এমন এক বৃক্ষ যা জাহান্নামের গভীরদেশ থেকে উদ্গত হয়। (অর্থাৎ মাখন আর খোরমা নয়। যেহেতু আগুনেই এর জন্ম, তাই তাতে টিকে থাকা এর পক্ষে অবান্তর নয়। যেমন, 'সমন্দর' নামক এক প্রকার কীট আগুনে জন্মলাভ করে এবং আগুনেই থাকে। অতপর যাক্কুমের একটি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে,) এর গুচ্ছ সাপের ফণার মত (কদাকার। এ বৃক্ষের দ্বারা জালিমদেরকে আপ্যায়ন করা হবে।) কাফিররা ক্ষুধার তাড়নায় (যখন আর কিছুই পাবে না, তখন) এটি ভক্ষণ করবে এবং (ক্ষুধায় অস্থির থাকার দরুন) এর দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি (পিপাসায়) ছটফট করে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে পানি (পুঁজের সাথে) মিশিয়ে দেওয়া হবে। (এখানেই বিপদের শেষ নয়, বরং) তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (অর্থাৎ এরপরও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে। তাদের এই শাস্তি এ জন্য যে,) তারা (আল্লাহ্র হিদায়েতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী, অতপর তারাও তাদের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দ্রুত চলছিল। (অর্থাৎ একান্ত আগ্রহভরে তাদেরই বিপথগামিতার অনুসরণ করেছিল।) তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফিরদের) পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। (আমি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের কেমন (অশুভ) পরিণতি হয়েছে। (তারা সতর্ককারী পয়গম্বরগণকে মানেনি। ফলে দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে।) তবে আল্লাহ্র খাছ বান্দাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) কথা স্বতন্ত্র। (তারা পার্থিব আযাব থেকে মুক্ত রয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে বলা হয়েছেঃ

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ —জান্নাতের যেসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম?

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা নামক অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন ঃ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে 'থোহ্‌ড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' (ফণিমনসা) নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাক্কুমের মত হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশি কদাকার ও কণ্টভক্ষ হবে।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ---অর্থাৎ আমি যাক্কুম বৃক্ষকে জালিমদের জন্য ফেতনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ ফেতনার অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ফেতনার অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফিরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনা-সম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবূ জাহল তার সহচরদেরকে বলল ঃ তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।---(দুররে মনসুর)। আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবূ জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন ঃ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদ্‌গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে।

طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ——এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيٰطِيْن-এর অনুবাদ করেছেন সাপ। অর্থাৎ যাক্কুম ফল সাপের ফণার মত হয়ে থাকে। উর্দুতে একে 'নাগফন' (ফণিমনসা) এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيٰطِيْن বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, শয়তানকে তো কেউ দেখেনি, সুতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে কি? জওয়াব এই যে, এটি একটি কল্পনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিশ্রী ও কুৎসিত বস্তুকে শয়তান ও ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়ান্ত পর্যায়ে কদর্যতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে ব্যবহৃত তুলনাও এমনি ধরনের।——(রূহুল মা'আনী)

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

---

(৭৫) আর নূহ্ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা সংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম (৭৭) এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অতপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর নূহ (আ) আমাকে (সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল (অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল।) আর (আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং) আমি প্রার্থনার চমৎকার সাড়াদানকারী। আমি তাকে ও তার অনুসরণকারীদেরকে এক মহা সংকট থেকে (যা কাফিরদের

মিথ্যারোপ ও উৎপীড়নের কারণ দেখা দিয়েছিল) রক্ষা করেছিলাম (অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের মাঝে কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।) এবং আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (পরবর্তীতে অন্য কারও বংশপরম্পরা প্রচলিত থাকেনি।) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় (সুদীর্ঘ কালের জন্য) প্রচলিত রেখেছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (অর্থাৎ আল্লাহ্ করুন, তার প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসী—জিন-ইনসান ও ফেরেশতাকুল সালাম প্রেরণ করুক।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনিভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। অতপর আমি অন্য (পন্থী) লোকদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ — এতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ) আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানেও 'ডাকা' বলতে সূরা নূহে উল্লিখিত নূহ (আ)-এর رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (অর্থাৎ পরওয়ারদিগার, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও অবশিষ্ট রেখ না,) দোয়া বোঝানো হয়েছে। অথবা সূরা কমরে উল্লিখিত এই দোয়া বোঝানো হয়েছে أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ—(আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর।) স্বজাতির উপর্যুপরি অবাধ্যতার পর হযরত নূহ (আ) এ দোয়া তখন করেছিলেন, যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ—(আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।) অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ)-র সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর

পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারাবিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল 'সাম' তারই সন্তান-সন্ততি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের বংশধারা শুরু হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'হাম'। আফ্রিকান দেশসমূহের জনবসতি তার বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ কেউ ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকেও এ বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় পুত্র ছিল 'ইয়াফেছ'। তার সন্তানদের থেকে তুর্কী, মঙ্গোলীয় এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বংশ নির্গত হয়। হযরত নূহ (আ)-র নৌকায় আরোহণ করে প্রাণ রক্ষা করতে যারা সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে নূহ (আ)-র এ তিন পুত্র ছাড়া অন্য কারও বংশ বিস্তার লাভ করেনি।

তবে অতি অল্পসংখ্যক আলিম এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, নূহ (আ)-র তুফান বিশ্বগ্রাসী ছিল না বরং কেবল আরব ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল নূহ (আ)-র সন্তানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং তাদের থেকেই আরবদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। দুনিয়ার অন্যান্য ভূ-খণ্ডে অন্যদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করেনি, একথা আয়াত থেকে বোঝা যায় না। ----(বয়ানুল কোরআন)

তৃতীয় একদল তফসীরবিদ বলেন, নূহের তুফান বিশ্বগ্রাসীই ছিল এবং দুনিয়ার বংশধর কেবল নূহ (আ)-র পুত্রত্রয় থেকে নয়, বরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আসল উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি।----(কুরতুবী)

কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তৃতীয় উক্তি খুবই দুর্বল, প্রথম উক্তি সর্বোত্তম। কারণ, কোন কোন হাদীস থেকেও এমতের সমর্থন পাওয়া যায়, যা ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হুযুরে আকরাম (সা) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সাম আরববাসীদের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়াবাসীদের এবং ইয়াফেছ রোমকদের আদি পুরুষ।----(রূহুল মা'আনী)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ---(আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।) এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আ)-র পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্মশাস্ত্রে হযরত নূহ (আ)-র নবুয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ
لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ
أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ
بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

(৮৩) আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৮৪) যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুস্থ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল, (৮৯) এবং বলল ঃ আমি পীড়িত হতে যাচ্ছি। (৯০) অতপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে (৯৫) সে বলল ঃ তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? (৯৬) অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) তারা বলল ঃ এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। (৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ইবরাহীমও ছিলেন নূহপন্থীদের একজন [অর্থাৎ তাদের একজন ছিলেন যারা মৌলিক বিশ্বাসে নূহ (আ)-এর সাথে একমত ছিল। তাঁর সে ঘটনা স্মরণযোগ্য,] যখন তিনি সুষ্ঠুচিত্তে তাঁর পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ('সুষ্ঠু চিত্তে'----অর্থ, তাঁর অন্তর কুবিশ্বাস ও লৌকিকতার প্রেরণা থেকে মুক্ত ছিল।)

যখন তিনি (মূর্তিপূজারী) পিতা ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা কি (তুচ্ছ) বস্তুর পূজা করছ? তোমরা কি মিছেমিছি দেবতাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাও? তাহলে বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? [অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর ইবাদত বর্জন করে রেখেছ তাতে তাঁর উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথমত এরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদি থাকে, তবে তা দূর করা উচিত। -মোটকথা, ইবরাহীম এবং তাদের মাঝে প্রায়ই এমনি ধরনের বাকবিতণ্ডা চলত। এক দিনের ঘটনা, সেটি তাদের কোন পর্বের দিন ছিল। তারা ইবরাহীম (আ)-কেও মেলায় নিয়ে যেতে চাইল।] কিন্তু ইবরাহীম (আ) তারকাদের প্রতি একবার চাইলেন এবং বললেনঃ আমি পীড়িত হতে যাচ্ছি। (কাজেই মেলায় যেতে পারছি না।) তারা (তাঁর এই অজুহাত শুনে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। কারণ, পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি নিজে এবং তাঁর কারণে অন্যরাও কষ্ট করবে।) তখন তিনি তাদের দেবালয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং (উপহাসচ্ছলে প্রতিমাদেরকে) বললেনঃ তোমরা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) খাচ্ছ না কেন? (তাছাড়া তোমাদের কি হল যে, কথাও বলছ না? অতঃপর তিনি সজোরে প্রহার করতে করতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন (এবং কুড়াল মেরে মেরে সব চুরমার করে দিলেন।) অতপর (গোত্রের লোকেরা যখন জানতে পারল, তখন) তারা তাঁর কাছে অস্থির হয়ে (ক্রোধভরে) ছুটে এল (এবং কথা কাটাকাটি শুরু হল)। তিনি বললেনঃ তোমরা কি এমন বস্তুর পূজা কর, যা নিজেরাই (স্বহস্তে) নির্মাণ কর? (যে বস্তু তোমাদের মুখাপেক্ষী, সে উপাস্য হবে কেমন করে?) অথচ তোমাদেরকে এবং তোমাদের নির্মিত এসব বস্তুসামগ্রীকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। (সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিত।) তারা (যখন তর্কে হেরে গেল, তখন রাগান্বিত হয়ে পরস্পর) বলতে লাগলঃ ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর (এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে) তাকে সে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। মোটকথা, তারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দাচরণ করতে চেয়েছিল (এবং মনে করেছিল, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন)। অতপর আমি তাদেরকেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছি। (বিস্তারিত কাহিনী সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ্ (আ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র জন্য অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ—মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত

ব্যক্তিবর্গের দলকে আরবী ভাষায় شِيعَة বলা হয়। এখানে شِيعَة শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত নূহ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পূর্বসূরি পয়গম্বর নূহ (আ)-এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়ের পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি হওয়াও সম্ভব। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝখানে হযরত হূদ ও সালেহ্ (আ) ব্যতীত কোন নবী আবির্ভূত হন নি।----(কাশশাফ)

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ---এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহ্‌র নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে 'পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে' কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত-কারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোন ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইবাদতকারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোন বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ---এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বেন এবং নিজের ধর্মের দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন।----(দুররে মনসুর, ইবনে জরীর)। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার মতলব আঁটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। হয়তো এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার

দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বললেনঃ আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎসব উদযাপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফিকাহ্ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে যেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্যঃ সর্বপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দানের পূর্বেই ইবরাহীম (আ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেনঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকারাজির দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যত অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও রাখে না, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তারকা-রাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً اِلَى النُّجُوْمِ বলা উচিত ছিল---

فِى النُّجُوْمِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করত। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ) ও তারকারাজির দিকে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবরাহীম (আ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিক-

তর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেন নি এবং এ কথাও বলেন নি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফিররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে, যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই যে কাফিররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আ) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেওয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফিরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য অস্পষ্টতার এই পন্থা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে। বয়ানুল কোর-আনেও তাই অবলম্বন করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা ঃ এখানে দ্বিতীয় আলোচনা এই যে, জ্যোতি-র্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা কি? নিম্নে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হল।

এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিহিত রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে গ্রীষ্ম ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ বলেন যে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। কোন তারকার কোন বিশেষ রাশিচক্রে চলে যাওয়া কারও জন্য সুখ ও সাফল্যের কারণ হয় এবং কারও জন্য দুঃখ ও ব্যর্থতার বার্তা বয়ে আনে। এর পর কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্যিকার প্রভাব-শালী মনে করে এবং কেউ কেউ বলে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী তো আল্লাহ্ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এসব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই দুনিয়ার অন্যান্য কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার এক কারণ হয়ে থাকে।

যারা তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক

ঘটনাবলীকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'নূ' নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রসূলুল্লাহ্ (সা)এ বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ্ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারণ পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী তো আল্লাহ্ তা'আলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারণ মেঘমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস শিরক নয়। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এ বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তারকারাজির পরিভ্রমণ ও তাদের উদয় ও অস্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব খোঁজ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি আস্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابى فامسكوا যখন তকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না), যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের (অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ ইত্যাদির) আলোচনা উঠে, তখন থেকে যাও।--(এরাকী প্রণীত এহ্ইয়াউল উলুম)

হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন ঃ

تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى البر والبحر ثم امسكوا—

জ্যোতির্বিদ্যা থেকে এতটুকু জ্ঞান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা স্থলে ও সমুদ্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও।----(গাযযালী প্রণীত এহইয়াউল উলুম)

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে পড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে বারণ করা হয়েছে মাত্র। ইমাম গাযযালী (র) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকা-

রাজিকেই সবকিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে তারকারাজি সত্যিকার প্রভাবশালী—এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জ্ঞান লাভের কোন পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও আন্দাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেনঃ مفيد و غير معلوم و معلوم و غير مفيد অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু অংশ উপকারী হতে পারে, তা কারও জানা নেই এবং যেটুকু অংশ মানুষের জানা আছে তা উপকারী নয়।

আল্লামা আলূসী রূহুল মা'আনীতে এ প্রসংগে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এসব দৃষ্টান্তে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বজনস্বীকৃত নিয়মানুযায়ী একটি ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করেছেন তারা শেষ পযন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লমী জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ 'আল মুজমাল ফিল আহকাম'-এ লিখেনঃ জ্যোতির্বিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জল্পনা-কল্পনা ও ধারণার জন্য অনেক ফাঁক রয়েছে।—(রূহুল মা'আনী)

আল্লামা আলূসী আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা একে সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারূপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সালা করে এবং এর কারণেই অন্যদের সম্পর্কে ভালমন্দ মতামত স্থির করে নেয়। সর্বোপরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোন কোন সময় মানুষকে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি পযন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই অসংখ্য অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিষ্ফল কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোন ফলাফল নিশ্চিতরূপে অর্জন করা যায় না, তখন দুনিয়ার কাজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অনর্থক এক নিষ্ফল বিষয়ের পেছনে পড়া ইসলামী শরীয়তের

মর্ম ও মেযাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন ঃ إِنِّي سَقِيمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে তিনি এ কথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-'তওরিয়া' করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আ)-এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে দেখে তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيمٌ শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مَرِيضٌ শব্দের অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা। 'আমার মন খারাপ' বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, إِنِّي سَقِيمٌ বলে ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় اسم فاعل-এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ-এর বাহ্যিক অর্থ এমনও হতে পারে——আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ এই যে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনি-ভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) إِنِّي سَقِيمٌ-এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।' এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেযাজে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তখন বাস্তবিকই অল্পবিস্তর অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই

এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আ)-এর তওরিয়ার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি إِنِّي سَقِيمٌ-এর জন্যে كَذِبٌ (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে: مَا مِنْهَا كَذِبٌ أَلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللهِ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহ্র দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كَذِب শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ আয়াতের অধীনে পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান: আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়ও জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। তওরিয়া দুই প্রকার। এক. উক্তিগত। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। দুই. কর্মগত। অর্থাৎ এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে 'ঈহাম'-ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিপাত করা অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি অনুযায়ী ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে করীম (সা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং কাফিররা তাঁর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল: ইনি কে? হযরত আবূ বকর জওয়াব দিলেন: هُوَ هَادٍ يَهْدِينِي "ইনি আমার পথপ্রদর্শক। আমাকে পথ দেখান।" শ্রোতা মনে করল যে, সাধারণ পথ প্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। তাই সে চলে গেল। অথচ হযরত আবূ বকরের উদ্দেশ্য ছিল 'ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক!' (রূহুল মা'আনী)

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিহাদের জন্য কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।---(মুসলিম)

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুক-ছলে বললেনঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেনঃ বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না—ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

এর পরবর্তী আয়াতসমূহের মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠছে। ঘটনার বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

(৯৯) সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। (১০১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৩) যখন

পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্য শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্য এক মহান জন্তু। (১০৮) আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীম [(আ) যখন তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন] বললেন ঃ আমি (তোমাদের কাছ থেকে হিজরত করে) আমার পরওয়ারদিগারের (পথে কোন) দিকে চললাম। তিনি আমাকে (ভাল জায়গার দিকে) পথ প্রদর্শন করবেন। (সেমতে তিনি সিরিয়ায় পৌঁছলেন এবং দোয়া করলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এক সৎ পুত্র দান করুন। অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (সে পুত্র জন্মগ্রহণ করল এবং কৈশোরে পৌঁছল।) অতপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম [(আ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পুত্রকে যবেহ্ করছেন। গ্রীবা কর্তিতও দেখেছেন কি না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি একে আল্লাহ্‌র আদেশ মনে করলেন। কারণ পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তিনি এই আদেশ পালনে ব্রতী হলেন। অতপর এ ব্যাপারে পুত্রের কি মত, তা জেনে নেওয়া জরুরী বিবেচনা করে পুত্রকে] বললেন ঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে (আল্লাহ্‌র আদেশে) যবেহ করছি। এখন তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি? সে বলল ঃ পিতঃ, (এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করার কি আছে! আপনি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন, তখন) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, (নির্দ্বিধায়) তাই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়েই (আল্লাহ্‌র আদেশ) মেনে নিলেন এবং পিতা পুত্রকে (যবেহ্ করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিলেন, (অতপর গলা কাটতে উদ্যত হলেন,) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম, (শাবাশ) তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। (অর্থাৎ স্বপ্নে যে আদেশ করা হয়েছিল, নিজের পক্ষ থেকে তা পুরোপুরি পালন করেছ। এখন আমি আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। অতএব তাকে ছেড়ে দাও। ইবরাহীম পুত্রকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে প্রাণও রক্ষা পেল এবং তদুপরি উচ্চ মর্তবাও লাভ হল।) আমি

সৎকর্মীদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (দু'জাহানের সুখ তাদেরকে দান করি।) নিশ্চিতই এটা ছিল এক মহা পরীক্ষা, [যা খাঁটি কামিল পুরুষ ছাড়া কেউ বরদাশত করতে পারে না। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আমি পুরস্কারও দিয়েছি বিরাট। এতে যেমন ইবরাহীম (আ)-এর পরীক্ষা ছিল, তেমনি ইসমাঈল (আ)-এরও ছিল। সুতরাং সে-ও পুরস্কারে অংশীদার হবে। আমি] এর বিনিময়ে (যবেহ্ করার জন্য) একটি মহান জন্তু দিলাম। [ইবরাহীম (আ) যেটি যবেহ করেন।] আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (সেমতে তার নামের সাথে আজ পর্যন্ত আলাইহিস সালাম বলা হচ্ছে।) আমি সৎকর্মীদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে মানুষের দোয়া ও নিরাপত্তার সংবাদের কেন্দ্র করে দেই।) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের একজন। আমি (তাঁর প্রতি এক অনুগ্রহ করেছি এই যে) তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। সে নবী এবং সৎকর্মীদের অন্যতম। আমি ইবরাহীম ও ইসহাককে বরকত দান করেছি। (তন্মধ্যে এক বরকত এই যে, তাদের বংশ খুব বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তাতে বহু সংখ্যক পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছে। অতপর) তাদের বংশধরগণের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক এমনও (রয়েছে) যারা (অপকর্ম করে) প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ক্ষতি করে যাচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পুত্র কোরবানীর ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিষয়বস্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে। এখানে কতক ঐতিহাসিক বিবরণ আয়াতসমূহের তফসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي—[ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ আমি তো আমার পরওয়ারদিগারের দিকে চললাম।] দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদিগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদিগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর ইবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছলেন। এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (পরওয়ারদিগার, আমাকে এক সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ —(অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) 'সহনশীল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই ঃ হযরত সারা যখন দেখলেন যে তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করে নিলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফিরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খিদমতের জন্য দান করেছিলেন। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর খিদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। অতপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) তার নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

—[অতপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি।] কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।—(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই হয়ে থাকে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।—(তফসীরে কবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ্ করা ছিল না এবং ইবরাহীম (আ)-কেও এ আদেশ দেওয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ্ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল এ আদেশ দেওয়া যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ্ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুত এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেওয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে যবেহ্ করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আ)

বুঝে নিলেন যে, যবেহ্ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এখানে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ—কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা-বাসনা ও দোয়া প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল যে, সে পিতার বাহুবল হয়ে আপদে-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াবে। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।—(মাযহারী)

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ -(অতএব তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্য জিজ্ঞেস করেন নি যে, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমত তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আ) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্ হওয়ার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।—(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কোরআন)

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই পুত্র এবং স্বয়ং ভাবী পয়গম্বর। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ—(পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সামনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইসমাঈল (আ) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি

জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

অপঠিত ওহীর প্রমাণ ঃ এতেই হাদীস অস্বীকারকারীদের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা তিলাওয়াত করা হয় না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বলে যে, ওহী এক-মাত্র তাই, যা আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ওহীর অন্য কোন প্রকার বিদ্যমান নেই। উপরোক্ত ঘটনা থেকে তাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র কোরবানীর নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ) পরিষ্কার ভাষায় একে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহীর অস্তিত্বই না থাকবে, তবে ঐ নির্দেশটি কোন্ আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল?

হযরত ইসমাঈল (আ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল, তা খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একথাও বলতে পারতেন, 'ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন'; কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, 'সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্, আমিও তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, আত্মপ্রীতি ও অহমিকার নাম-গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। ——(রূহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন লম্বা-চওড়া দাবি করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া চাই যে, নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রতা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا ——(যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اَسْلَمَا শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ্ করতে এবং পুত্র যবেহ্ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব ইবাদত উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে কোরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন ইসমাঈল (আ) পিতাকে বললেন ঃ পিতঃ, আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ বৎস, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্য তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ—(এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন যাতে কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ আরবী ভাষায় جبين কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় جبهة এ কারণেই হযরত থানভী (র)-এর অনুবাদ করেছেন বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।" কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন 'উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন'। যাই হোক, ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম (আ) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন; কিন্তু বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ, আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না। এ ছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ) তাকে এভাবে শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালাতে লাগলেন।—(মাযহারী)

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا—(আমি তাকে ডেকে

বললাম ঃ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবত এ বিষয়টি শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম (আ) যবেহ্ করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ—(আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ—(আমি যবেহ্ করার জন্য এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা ছিল সে ভেড়া যা হযরত আদম (আ)-এর পুত্র হাবীল কোরবানী করেছিলেন।

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেওয়া হলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে عظيم (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না।—(মাযহারী)

কোরবানী ইসমাঈল (আ) হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ)? ঃ একথা মেনে নিয়ে উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীর করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যে পুত্রকে যবেহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, সে পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, মসরুক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহরী, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন ইসহাক (আ)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা, আবূ তোফায়েল, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মুজাহিদ, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, শা'বী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ও অন্য বহু তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

পরবর্তী তফসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথম উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি অবলম্বন করে প্রথম উক্তির কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। এখানে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এবং রেওয়ায়েতসমূহের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে এটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ

১. কোরআন পাক পুত্র কোরবানীর আগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে ঃ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ—(আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি হবেন নবী ও সৎ লোকদের অন্যতম।) এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যে পুত্রের কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হযরত ইসহাক নন—অন্য কেউ। এছাড়া হযরত ইসহাকের সুসংবাদ কোরবানীর ঘটনার পরে দেওয়া হয়েছে।

২. হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদে আরও উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী হবেন। অন্য আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকুব (আ) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি এই ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ -এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসহাক (আ) সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে যবেহ্ করার আদেশ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাভের পূর্বে যবেহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম (আ) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো এখনও নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার ঔরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম অবধারিত। তাই যবেহ্ করলে তার মৃত্যু হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় এটা কোন পরীক্ষা হত না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোন প্রশংসার যোগ্য হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ইবরাহীম (আ) একথা পুরোপুরি বুঝতেন যে, তাঁর পুত্র যবেহ্ করলে মারা যাবে, এরপর তিনি যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি।

৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। কারণ, তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ারই জওয়াবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর গৃহে এক সহনশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। অতপর এই পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে

উপনীত হল, তখন তাকে যবেহ্ করার নির্দেশ হল। সুতরাং ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হযরত ইসমাঈলই ছিলেন প্রথম পুত্র এবং হযরত ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল।

৪. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুত্র-কোরবানীর এ ঘটনা মক্কা মোকাররমার নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরবদের মধ্যে সর্বদা হজ্জের সময় কোরবানী করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্রের বিনিময়ে যে ভেড়া জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাসীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং আমের শা'বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি কা'বা গৃহে এই ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।' হযরত সুফিয়ান বলেনঃ এই ভেড়ার শিং অনবরত কা'বায় ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা'বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এই শিং ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ) বাস করেছিলেন—হযরত ইসহাক (আ) নয়। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, যবেহ্ করার হুকুম হযরত ইসমাঈলের সাথে জড়িত ছিল—হযরত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী যবেহ্ করার আদেশ হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসীর লিখেনঃ

আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন; কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উক্তি কা'ব আহবার থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত উমর (রা)-কে তার প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয়বস্তু শুনাতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে খলীফা তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে অন্যরাও সুযোগ পায় এবং তারাও তার রেওয়ায়েত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। এসব রেওয়ায়েতে সত্য মিথ্যা সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকত। মুসলিম উম্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য থেকে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাসীরের উপরোক্ত বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, হযরত ইসহাককে যবেহ্র আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই 'ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে হযরত ইসহাককে যবেহ্ করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

এসব বিষয়ের পর খোদা আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেনঃ হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বললেনঃ তুমি

তোমার একমাত্র ও আদরের পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে পাহাড়ের কথা বলব, সেই পাহাড়ে তাকে কোরবানীর জন্য পেশ কর। (জন্ম ২২, ১ ও ২)

এতে যবেহ করার ঘটনাকে হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এখানে ইহুদীরা তাদের ঐতিহ্যগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তওরাতের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ, জন্ম অধ্যায়ের উপরোক্ত বাক্যাবলীতেই 'তোমার একমাত্র পুত্র' কথাটি ব্যক্ত করছে যে, কোরবানীর হুকুমের সাথে জড়িত পুত্র হযরত ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিল। এ অধ্যায়েই অতপর আরও লিখিত আছে ঃ

"তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করনি" (জন্ম ২২, ১২)

এ বাক্যেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইসহাক তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। একমাত্র পুত্র বলতে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন। জন্ম অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যাবলী এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইসমাঈলের জন্ম হযরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল। দেখুন ঃ

"এবং আব্রাহামের স্ত্রী সারার কোন সন্তান হয়নি। তার হাজেরা নাম্নী এক মিসরীয় বাঁদী ছিল। আব্রাহাম হাজেরার কাছে গেল এবং সে গর্ভবতী হল। খোদা-ওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বলল ঃ তুমি গর্ভবতী, তোমার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে আব্রাহামের পুত্র ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর।" (জন্ম-১৬-১ ৪, ১০, ১৬)

এর পরবর্তী অধ্যায়ে আছে ঃ

"এবং খোদা আব্রাহামকে বলল ঃ তোমার স্ত্রী সারার গর্ভ থেকেও তোমাকে এক পুত্র দান করব। তখন আব্রাহাম নতশির হয়ে হেসে মনে মনে বলল ঃ শত বছরের বৃদ্ধের ঔরসেও সন্তান হবে? আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্তান হবে? আব্রাহাম আল্লাহ্‌কে বলল ঃ আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার ঔরসে সারার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক।" (জন্ম ১৭, ১৫—২০) এর পর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ

"এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের বয়স ছিল শত বছর।" (জন্ম ২১-৫)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোন দিনই পিতার একমাত্র

সন্তান ছিলেন না। এরপর জন্মগ্রন্থের ২২তম অধ্যায়ে পুত্র কোরবানীর আলোচনায় 'একমাত্র' শব্দটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমাত্র পুত্র এবং কোন ইহুদী হয়তো এর সাথে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসমাঈল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

এ ছাড়া বাইবেলের জন্মগ্রন্থের যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরও বলা হয়েছেঃ

"নিশ্চিতই আমি তাকে (ইসহাককে) বরকত দেব--তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে।" (জন্ম ১৭, ১৬)

বলাবাহুল্য, যে পুত্র সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কোরবানী করার হুকুম কিরূপে দেওয়া যেতে পারে? এ থেকেও জানা যায় যে, কোরবানীর হুকুম হযরত ইসহাকের সাথে নয়--ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

বাইবেলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখার পর ইবনে কাসীরের নিম্নোক্ত অভিমত যে কত নির্ভুল, তা সহজেই অনুমান করা যায়ঃ

"ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ একশ বছর। এসব গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমাত্র পুত্র যবেহ্ করার হুকুম দিয়েছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে 'একমাত্র' শব্দের পরিবর্তে 'প্রথম' শব্দও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ইহুদীরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোন বৈধতা নেই। কেননা, এটা স্বয়ং তাদের গ্রন্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে। এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহাক তাদের পিতৃপুরুষ এবং হযরত ইসমাঈল আরবদের পিতৃপুরুষ। সুতরাং হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তারা 'একমাত্র' শব্দের অর্থ এই বর্ণনা করে যে, "আদেশ দেওয়ার সময় তোমার নিকট উপস্থিত একমাত্র পুত্র।" কারণ, হযরত ইসমাঈল তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হযরত ইসহাককে এই অর্থে একমাত্র বলা যায়।) কিন্তু এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ, যে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোন সন্তান নেই, তাকেই 'একমাত্র' সন্তান বলা হয়।---(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হাফেয ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে জনৈক ইহুদী আলিম ইসলাম গ্রহণ করলে উমর ইবনে আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ইবরাহীম (আ)-এর কোন পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল? সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম আমিরুল মু'মিনীন, সে পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। ইহুদীরা এটা ভালভাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম বলে।

উপরোক্ত প্রমাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল।

وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ —(তাঁদের উভয়ের বংশধর-দের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

---

(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়ত ও অন্যান্য পরাকাষ্ঠা দানের মাধ্যমে) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল)-কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফিরাউনের নির্যাতন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফেরাউনের বিরুদ্ধে) সাহায্য

করেছিলাম। ফলে (শেষ পর্যন্ত) তারাই ছিল বিজয়ী। (ফেরাউন নিমজ্জিত হয় এবং তারা রাজত্ব লাভ করে।) আমি (ফেরাউন নিমজ্জিত হওয়ার পর) উভয়কে (অর্থাৎ মূসাকে সরাসরি ও হারূনকে অনুসারীরূপে) সুস্পষ্ট কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়েছিলাম (এতে বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত ছিল।) এবং তাদেরকে সরল পথে কায়েম রেখেছিলাম। (এর সর্বোচ্চস্তর হিসাবে তাদেরকে নিষ্পাপ পয়গম্বর করেছিলাম)। আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (সেমতে উভয়ের নামের সাথে আজ পর্যন্ত 'আলাইহিস সালাম' বলা হয়।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দেই।) নিশ্চয় তারা উভয়ই ছিল আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (তাই প্রতিদানও পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ও হারূন (আ)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে—এক. ধনাত্মক নিয়ামত, অর্থাৎ উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ — আয়াতে এ ধরনের নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দুই. ঋণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামত। পরবর্তী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ
بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

(১২৩) নিশ্চয় ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি বা'আল দেবতার ইবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! (১৩১) এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইলিয়াস (আ)-ও ছিলেন (বনী ইসরাঈলের) রসূলগণের একজন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তাঁর (পৌত্তলিক বনী ইসরাঈল) সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? তোমরা কি বা'আল (যা একটি দেবমূর্তির নাম)-এর পূজা করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে (অর্থাৎ তাঁর ইবাদতকে) পরিত্যাগ করবে (আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এজন্য যে, অন্যরা কেবল কোন কোন বস্তুর সংমিশ্রণ ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখে, তাও সাময়িকভাবে, কিন্তু আল্লাহ্ যাবতীয় বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়া অন্য কেউ প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না, তিনিই প্রাণ সঞ্চার করেন।) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও পালনকর্তা। অতপর তারা (তওহীদের এই দাবির কারণে) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল ঃ সুতরাং (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) তারা (পরকালের আযাবে) গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা (তারা সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে)। আমি ইলিয়াসের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসীনের প্রতি (এটাও তাঁর নাম) সালাম বর্ষিত হোক। আমি এমনিভাবে খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দিই।) নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইলিয়াস (আ) ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা দেখা যায়---সূরা আন'আমে ও সূরা সাফ্ফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে

কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্পসংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আ)-এরই অপর নাম, এই দু' ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আ) ও হযরত খিযির (আ) অভিন্ন ব্যক্তি। (দুররে মনসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ এসব উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ্।—(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

নবুয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান ঃ হযরত ইলিয়াস (আ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর পর এবং হযরত আল্‌ইয়াসা' (আ)-র পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়াহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আ) জর্দানে 'জলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে 'আখিয়াব' এবং আরবী ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লিখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবিল বা'আল নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।—(তফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, মযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন)

সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ ঃ অন্যান্য পয়গম্বরকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম

ঘটেনি। তবে কোরআন পাক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, তাই এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে এতে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন কেবল এতটুকু অংশই বর্ণনা করেছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তফসীরসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেনঃ এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহ্‌র নাফরমানী। তোমরা এখনও বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ করব। যার কুরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে 'কোহে করমল' নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতপর হযরত ইলিয়াস (আ) কুরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সিজদায় পড়ে গেল। তাদের

সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না; ফলে হযরত ইলিয়াস (আ) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আ) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌঁছে দীনের তবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আ)-এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেওয়া হল। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ)-র মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেসব রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আবহার বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়গম্বর এখনো পর্যন্ত জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস—এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর)। এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।—(কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলিমগণ এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ মনে করেন নি। তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন ঃ

وهو من الاسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر ان صحتها بعيد

এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। এগুলোর সত্যতা সুদূর পরাহত।—(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

তাঁরা আরও বলেনঃ

ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনটিই সন্তোষজনক নয়; দুর্বল সনদের কারণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের অপরিচিতির কারণে।---(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহ্যত তাই ঠিক। বাইবেলে আছেঃ

"আর তাঁরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিলঃ দেখ, একটি আগ্নেয় রথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াহ্ ঘূর্ণি হাওয়ায় আকাশে চলে গেল।"---(সালাতীন---২ঃ ১১)

এ কারণেই ইহুদীদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হযরত ইলিয়াস (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাজেই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) পয়গম্বর-রূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহান্নার ইঞ্জিলে আছেঃ

"তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি কে? তুমি ইলিয়াহ্? সে বলল ঃ না, আমি নই।" --(ইয়ুহান্না—১ঃ ২১)

মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় আলিম যাঁরা আহলে-কিতাবদের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই এসব রেওয়ায়েত মুসলমানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। ফলে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর অদ্যাবধি জীবিত থাকার মতবাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত অথবা আকাশে উত্থিত হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। মুস্তাদরাক হাকেমে একটিমাত্র রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাবূক গমনের পথে ইলিয়াস (আ)-এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু হাদীসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াট। হাফেয যাহাবী বলেনঃ

بل هو موضوع قبح الله من وضعه وما كنت احسب ولا اجوزان الجهل يبلغ بالحاكم الى ان يصحح هذا -

("বরং এই হাদীসটি মওযু। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। ইতিপূর্বে আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, ইমাম হাকিমের অজ্ঞতা এতদূর পৌঁছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে দিবেন।")---(দুররে মনসূর)

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই নিরাপত্তার

উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষা এই যে, "এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।" ইলিয়াস (আ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই বিপদমুক্ত পথ। কেননা কোরআনের তফসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য এগুলো ছাড়াও পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে।

আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষণীয়—

أَتَدْعُونَ بَعْلًا—(তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) 'বা'আল'-এর আভিধানিক অর্থ 'স্বামী', 'মালিক' ইত্যাদি। কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আ)-র যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বা'আলাবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।—(কাসাসল কোরআন)

وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ—(এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা। 'সর্বোত্তম স্রষ্টা'-র অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরতুবী)। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে خالق শব্দটি صانع (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরি করে। কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।—(বয়ানুল কোরআন)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত—সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ—(অতপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সত্য রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ—এখানে مخلصين শব্দের লাম-এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা 'মনোনীত' করা অধিক সমীচীন।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ—'ইলিয়াসীন' ও ইলিয়াস (আ)-এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে 'ইয়া' ও 'নূন' বর্ণ যুক্ত করে দেয়। যেমন, سينا থেকে سنين বলে। এখানেও তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

(১৩৩) নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন। (১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে অন্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) অতপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই লূত (আ)-ও পয়গম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণীয়—) যখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, কিন্তু

এক বৃদ্ধাকে (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীকে) ছাড়া। সে (আযাবে) যারা থেকে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়ে গেল। অতপর আমি অবশিষ্টদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (এ কাহিনী কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। হে মক্কাবাসীরা,) তোমরা তো (সিরিয়ার সফরে) তাদের (ধ্বংসস্তূপের) উপর দিয়ে (কখনও) ভোরে এবং (কখনও) সন্ধ্যায় অতিক্রম কর (এবং ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ কর) তবুও কি তোমরা বুঝ না? (কুফরের কি পরিণতি হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে কুফর করবে, তার জন্যও এরূপ আশংকা রয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্র অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণত এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবূ সউদ বলেনঃ খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।—(তফসীরে আবূ সউদ)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ
مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ
وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

(১৩৯) আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। (১৪০) যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (১৪১) অতপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫)

অতপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম। (১৪৭) এবং তাঁকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করল; অতপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় ইউনুস (আ)-ও পয়গম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি [তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্র আদেশে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে নিজে সেখান থেকে সরে গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে যখন আযাবের লক্ষণ দেখা দিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনার জন্য ইউনুস (আ)-কে খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। অগত্যা তারা আল্লাহ্র উদ্দেশে খুব কান্নাকাটি করল এবং সংক্ষেপে ঈমান আনল। ফলে আযাব অপসারিত হয়ে গেল। ইউনুস (আ) কোনরূপে এ সংবাদ পেয়ে লজ্জার কারণে সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াই কোন দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর অবস্থান থেকে] পালিয়ে (রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে নদী ছিল। তাতে ছিল যাত্রী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌঁছলেন। (নৌকা রওয়ানা হতেই ঝড় দেখা দিল। যাত্রীরা বললঃ আমাদের মধ্যে কোন নতুন দোষী ব্যক্তি আছে। তাকে নৌকা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। সে লোক-টিকে চিহ্নিত করার জন্য যাত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হল) অতপর তিনি [অর্থাৎ ইউনুস (আ)] লটারী (সুরতি)-তে অংশগ্রহণ করলেন, (পরীক্ষায়) তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। (অর্থাৎ লটারীতে তাঁর নামই উঠল। সুতরাং তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। সম্ভবত তীর নিকটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌঁছার আশায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন; আত্মহত্যার ইচ্ছায় নয়।) অতপর (নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর আমার হুকুমে) একটি মাছ তাকে (আস্ত) গিলে ফেলল। তিনি তখন নিজেকে (এই ইজতেহাদী ভ্রান্তির কারণে) ধিক্কার দিচ্ছিলেন। (এটা ছিল আন্তরিক তওবা। তিনি মুখেও তসবীহ পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য এক আয়াতে আছে যে, এই তসবীহ ছিল---لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)

যদি তিনি (তখন আল্লাহ্র) তসবীহ (ও ইস্তেগফার) পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন। (উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হত না এবং তিনি মাছেরই খোরাক হয়ে যেতেন।) অতপর (যেহেতু তিনি তসবীহ ও তওবা করেছেন, তাই) আমি (তাঁকে নিরাপদ রেখেছি এবং মাছের পেট থেকে বের করে) তাঁকে এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি, (অর্থাৎ আমি মাছটিকে নির্দেশ করলাম যে, তাঁকে নদীতীরে উদ্গীরণ কর।) তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। (কেননা মাছের পেটে পর্যাপ্ত বায়ু ও খাদ্য পৌঁছাত না।) আমি (রৌদ্র থেকে

ছায়া দানের জন্য) তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করেছি। (এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত।) আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি (মুসেলের নিকটবর্তী নায়নুয়া শহরে) প্রেরণ করেছিলাম। অতপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। [অর্থাৎ আযাবের লক্ষণ দেখে তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর ইউনুস (আ) পুনরায় সেখানে গেলে তারা বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।] অতপর (ঈমানের বরকতে) আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এর সারকথা এসে গেছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ —কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ —(যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে। اباق শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ —(অর্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

লটারী (সুরতি) বিধান ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারী বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত লটারীযোগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিভাবে কোন বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ফয়সালাও লটারী তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে লটারী এমনক্ষেত্রে জায়েয বরং উত্তম, যেখানে কোন ব্যক্তি আইনত কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে সে যদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে কোন একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সফরে যাওয়ার সময় যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করতেন।

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনায়ও লটারীযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ—(অতপর তিনি পরাজিত হলেন।) ا د ح ا ض

এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্ম-হত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সম্ভবত নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌঁছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ—এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত।

তসবীহ্ ও ইস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্ ও ইস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষ-ভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ—এ কলেমার বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুযুর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের সময় উল্লিখিত কলেমা সোয়া লাখ

বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ দূর করেন।

আবূ দাউদে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর পঠিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে।—(কুরতুবী)

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ——(অতপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ——(আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদ্গত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يقطين বলা হয়। রেওয়ায়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল شجرة শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্ তা'আলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ——(আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক—এ বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত থানভী (র) বলেন ঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে একলাখের কিছু বেশী ছিল।----(বয়ানুল কোরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আ) এ ঘটনার পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোর-

আন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আ)-এর রিসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ—(বস্তুত তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 'কিছুকাল পর্যন্ত' -এর উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল।

মির্যা কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির জওয়াব ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যথা-সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা সূরা ইউনুসের তফসীরেও বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে উঠেছে। এরই ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদি তারা বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের উপর আযাব এসে যাবে। এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যায় অথচ আযাব আসেনি। তখন এই ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকা দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই আযাব অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর থেকে সরে গিয়েছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ঈমানের কারণে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দূরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলেন।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ
اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ
اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنٰتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ
تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾ فَاِنَّكُمْ
وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾
وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾

(১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্য কি কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান? (১৫০) নাকি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো; তারা মনগড়া উক্তি করে যে, (১৫২) 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হল, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্ ও জিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দা, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে না। (১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) তাদের কাউকেই তাঁর হাত থেকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না (১৬৩) শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা জাহান্নামে পৌঁছবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি (১৬৬) এবং আমরাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।) অতপর [যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা এবং জিন সরদারদের কন্যাদেরকে ফেরেশতাগণের জননী বলে সাব্যস্ত করে---(নাউযুবিল্লাহ) যাতে ফেরেশতাগণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক এবং জিনদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অপরিহার্য হয়ে পড়ে----যারা আল্লাহ্র সাথে ফেরেশতা ও জিন জাতিকে এভাবে শরীক স্থির করে] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্র জন্য কি রয়েছে কন্যা-সন্তান আর তাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান। (অর্থাৎ তোমরা যখন নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান পছন্দ কর, তখন উপরোক্ত বিশ্বাসে আল্লাহ্র

জন্য কন্যা-সন্তান কেমন করে সাব্যস্ত কর? এই হচ্ছে সে বিশ্বাসের প্রথম ত্রুটি। আরও শোন,) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (অর্থাৎ দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, তারা বিনা প্রমাণে ফেরেশতাগণের প্রতি নারীত্বের অপবাদ আরোপ করে।) জেনে রাখ, (তাদের কোন প্রমাণ নেই, বরং নিছক) তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। (সুতরাং এ বিশ্বাসের তৃতীয় ত্রুটি এই যে, এতে আল্লাহ্র সন্তান হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রথম ত্রুটি যে মন্দ তা সাধারণ প্রচলন দ্বারা, দ্বিতীয় ত্রুটি যে মন্দ, তা ইতিহাস-ভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা এবং তৃতীয় ত্রুটি যে মন্দ, তা যুক্তি-ভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মূর্খদের জন্য কোন বিষয় সাধারণের মধ্যে মন্দ প্রমাণিত করা হলে তা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। তাই প্রথম ত্রুটি ভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে—) আল্লাহ্ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত, (যা সাধারণের মধ্যে তোমরাও মন্দ মনে কর।) তোমরা কি অনুধাবন কর না (যে, এই বিশ্বাস যুক্তি-প্রমাণেরও পরিপন্থী? যদি যুক্তি-প্রমাণ না থাকে, তবে) তোমাদের কাছে এর সুস্পষ্ট কোন (ইতিহাস-ভিত্তিক) দলিল আছে কি? তোমরা (এতে) সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। (উপরোক্ত বিশ্বাসে ফেরেশতাগণকে সন্তান স্থির করা ছাড়াও) তারা আল্লাহ্র মধ্যে ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করেছে, (যা আরও স্পষ্টরূপে বাতিল। কেননা, যে কাজের জন্য স্ত্রী দরকার, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ক অসম্ভব হলে তারই শাখা—শ্বশুর সম্পর্কও অসম্ভব হবে।) অথচ জিনেরা জানে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের কাফিররা আযাবে) গ্রেফতার হবে। (কারণ তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ বিষয়াদি বর্ণনা করে। অথচ) আল্লাহ্ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে। (সুতরাং এসব বর্ণনার কারণে তারা আযাবে গ্রেফতার হবে।) কিন্তু যারা আল্লাহ্র খাঁটি (অর্থাৎ মু'মিন) বান্দা, (তারা আযাব থেকে বেঁচে থাকবে)। অতএব তোমরা এবং তোমরা যেসব উপাস্যের পূজা কর, তারা (সবাই মিলেও) আল্লাহ্ থেকে কাউকে বিচ্যুত করতে পারবে না, (বস্তুত তোমরা তো এ চেষ্টাই কর।) কিন্তু তাকেই (বিচ্যুত করতে পারবে) যে (আল্লাহ্র জ্ঞানে) জাহান্নামে পৌঁছবে। (অতপর বলা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে যারা ফেরেশতা, তারা বলে, আমরা তো কেবল দাস। আমাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নির্দিষ্ট স্তর রয়েছে (আমরা তাই পালনে রত থাকি। নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই করতে পারি না।) আমরা (আল্লাহ্র সামনে তাঁর হুকুম শোনার সময় অথবা তাঁর ইবাদত করার সময় আদব সহকারে) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি এবং আল্লাহ্র পবিত্রতাও বর্ণনা করি। (ফেরেশতাগণ নিজেরাই যখন দাসত্ব স্বীকার করছে, তখন তাদেরকে উপাস্য বলে সন্দেহ করা নিরেট বোকামি। সুতরাং জ্বিন ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্রূপে বিশ্বাস করা উত্তমরূপে বাতিল প্রমাণিত হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছিল। এখন আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফিরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা এবং জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেনঃ এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনূ সালমা, বনূ-খোযা'য়া ও বনূ সালীহ্‌দের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।—(তফসীর-কবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ ... ... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ—এসব আয়াতে কাফিরদের উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সারমর্ম এই যে, প্রথমত তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্‌র জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিন রকম দলীল হতে পারে—(১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজনস্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সম্ভব নয়।

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ—আয়াতের মতলব তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না।

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ—আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মুকাবিলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্য হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা

দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ — আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্য আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ঃ আলোচ্য আয়াত-সমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলা বাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তা-'আলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা-সন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলযামী জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোর-আন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا — (তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতা-গণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল ঃ জিনসরদার-দুহিতারা।---(ইবনে-কাসীর)। কিন্তু এই তফসীরে খট্‌কা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা বলেন ঃ কোন কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহ্র ভ্রাতা (নাউযুবিল্লাহ্)। আল্লাহ্ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ — (জিনদের বিশ্বাস এই যে,

তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জিনকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালরূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে নিজেই আযাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি!

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾

(১৬৭) তারা তো বলত (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা হতাম। (১৭০) বস্তুত তারা এই কোরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন শীঘ্রই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসূল বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, (১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, (১৭৩) আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। (১৭৪) অতএব আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৬) আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? (১৭৭) অতপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকালবেলাটি হবে খুবই মন্দ। (১৭৮) আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৯) এবং দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা [অর্থাৎ আরবের কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে] বলত, যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের (গ্রন্থের মত) কোন উপদেশ থাকত, (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে যেমন রসূল ও কিতাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি তেমন

হত,) তবে আমরা আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা হতাম। (অর্থাৎ সেই কিতাবকে সত্য মনে করতাম এবং তা মেনে চলতাম--তাদের মত মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা করতাম না।) অতপর (যখন সে উপদেশগ্রন্থ কোরআন রসূলের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছাল, তখন) তারা একে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কাজেই শীঘ্রই তারা (এর পরিণাম) জেনে নেবে। [সে মতে মৃত্যুর সাথে সাথেই কুফরের পরিণাম সামনে এসে গেছে এবং কোন কোন শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেও ভোগ করেছে। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শত্রুপক্ষের বর্তমান শান-শওকত ক্ষণস্থায়ী। কেননা,] আমার রসূল বান্দাগণের জন্য আমার এই বাক্য পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ লওহে-মাহফুযেই) অবধারিত আছে যে, নিশ্চয় তারাই হবে প্রবল এবং (আমার সাধারণ নিয়ম এই যে,) আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়ে থাকে। (এতে রসূলের অনুসারিগণও অন্তর্ভুক্ত।) অতএব, আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং) কিছুকালের জন্য (সবর করুন এবং তাদের বিরোধিতা ও উৎপীড়ন থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখুন এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও দেখে নেবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও এবং মৃত্যুর পূর্বেও তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ভীতি প্রদর্শনের হুমকির পরে তারা বলতে পারত এবং বলতও যে, এরূপ কবে হবে। এর জওয়াবে বলা হয়েছেঃ) তারা কি আমার আযাব দ্রুত কামনা করে? অতপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের দিন খুবই মন্দ হবে (আযাব সরবে না)। অতএব আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং) কিছুকাল পর্যন্ত (সবর করুন,) তাদের (বিরোধিতা ও উৎপীড়নের প্রতি) খেয়াল করবেন না এবং (তাদেরকে) দেখতে থাকুন (অর্থাৎ অপেক্ষা করুন)। শীঘ্রই তারাও দেখে নেবে। (অর্থাৎ আপনি তো শুনেই বিশ্বাস করেন, তারা দেখে বিশ্বাস করবে।)

আনুষঙ্গিক-জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোন পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী (সা)-র আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতপর রসূলে করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আযাবের লক্ষ্যবস্তু। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়াতেও আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জিহাদে আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সাফল্য দান করেছেন এবং শত্রুপক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন।

আল্লাহ্ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا - - - وَإِنَّ جُنْدَنَا

لَهُمُ الْغَالِبُونَ ---এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বরের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আযাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আযাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র)-র ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা আল্লাহ্-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির অবস্থায়ও শাস্তিত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ان لم ينصروا فى الدنيا ينصروا فى الاخرة (বয়ানুল কোরআন)

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামেমাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্র বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جُنْدَنَا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্র সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ---(যখন সে আযাব তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন

বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। 'সকাল' বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণত এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।—(মাযহারী)। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন ঃ الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (অর্থাৎ আল্লাহ্ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়েগেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

(১৮০) পবিত্র আপনার পরওয়ারদিগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। (১৮১) পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৮২) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিমিত্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার মহান পরওয়ারদিগার যিনি বিরাট মহিমার অধিকারী সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা (কাফিররা) বর্ণনা করে। (অতএব আল্লাহ্কে এসব বিষয় থেকে পবিত্রই সাব্যস্ত করুন এবং পয়গম্বরগণকে অবশ্য অনুসরণীয় মনে করুন। কেননা আমি তাঁদের শানে বলি ঃ) সালাম বর্ষিত হোক পয়গম্বরগণের প্রতি (এবং আল্লাহ্কে শিরক ইত্যাদি থেকে পবিত্র মনে করার সাথে সাথে তাঁকে সর্বগুণে গুণান্বিতও মনে করুন। কেননা) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক (ও মালিক) আল্লাহ্ তা'আলারই নিমিত্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্ফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সার-মর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর

দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতপর পুংখানুপুংখরূপে কাফিরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস---তওহীদ ও রিসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনের কর্তব্য তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহ্র মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায সমাপনান্তে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ—এই আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতত্রয় তিলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে আবী হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।—(তফসীর ইবনে কাসীর)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

سورة ص

সূরা ছোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ রুকূ, ৮৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢
كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣
وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤
اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ
اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا
فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ
بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨ اَمْ
عِنْدَهُمْ خَزَاۗىِٕنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩ اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو
الْاَوْتَادِ ۝١٢ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْــَٔيْكَةِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣
اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۗءِ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ ۝١٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ছোয়াদ---শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (২) বরং যারা কাফির, তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩) তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, অতপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। (৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুত ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; বরং ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকবিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা; এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ছোয়াদ (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।)---কসম উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (কাফিররা আপনার রিসালত অস্বীকার করে যা কিছু বলছে তা যথার্থ নয়) বরং (স্বয়ং) এ কাফিররাই বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। এ বিদ্বেষ ও বিরোধিতার শাস্তি একদিন তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। (যেমন,) তাদের পূর্বে অনেক উম্মতকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। অতপর তারা (ধ্বংস হওয়ার সময়) বড়ই হা-হুতাশ করে ডেকেছে (এবং আর্তনাদ করেছে) কিন্তু (তা করলে কি হবে,) তখন নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। (কারণ আযাব এসে গেলে তওবাও কবুল হয় না।) তারা (কোরায়শ কাফিররা) এ ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ যিনি তাদের মতই মানুষ) একজন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন। (বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা